International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 31-35
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'খন্ড বিখন্ড': সামাজিক সময়ের অন্তঃস্বর

ড. মাম্পি বৈদ্য
শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract

The poor and underprivileged people residing under the geographical, cultural, and political environment of Bangladesh are not considered to be as bengali, though their language for communication is Bengali. As they have a feeling of deep admiration about their own cast, it leads to grow a strong feeling of casteism among them. The novel Khanda Bikhand proved to be a solution for protecting the differences arises from the feelings of the different people. The novel enlighten us about the bengali people, along with the casts like dupka , orao, sanotal, munda, toto, malpahari, mdeshiya, lohar, garo, rajbangshi, nepali, mech, rabha, dhimaal-as the writer draws a beautiful sketch of their religion, culture, education, politics, dance, dress, and also discussed about several ritual of the societal cast. The novel gives a broader message "The common man faces problems due to game of power and politics".

History defines different images of Uttarbanga due to 'common or lower caste rajbangshi people' activities. We have seen after the freedom, West Purbanchal have several agitation which converts to violence due to interest in protection of own caste. In English, we can say 'ithno political'. Like lower caste people, the fight among the naga and kuki of Nagaland, mizo and brue of Mizoram, garo and khasi of Meghalaya are in the worst condition. The fear of terrorism has been seen in hilly regions as because of the different feelings of casteism of the hilly people belonging to different casts. The discussion is concerned with the society's ups and downs and based on Tapan Bandopadhyay's novel Khanda bikhanda.

সত্তর দশক বাংলার ইতিহাসে এক ধারাবাহিক অস্থিরতার সময়কাল। এই সময়পর্বে গ্রামবাংলায় যেমন দেখি ধান রোপন ও ধান কাটার ঋতুতে উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে ওঠে, কার গোলায় ধান তা নিয়ে চলে এক হিংস্র টানাপোড়ন, ব্যস্ত হয়ে ওঠে কোর্ট প্রাঙ্গনগুলি, তৎপর হয়ে উঠতে হয় পুলিশ ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে, তেমনি শহরাঞ্চলেও চলে বছর ভর আর এক তৎপরতা। সেখানে দেখা যায় দালাল আর সাপ্লায়ারদের ষড়যন্ত্র, সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার। তাই দেখি সত্তর দশকের লেখকদের আখ্যানে প্রকাশ পায় অন্য সুর। তাদের কলমে প্রকাশ পেতে থাকে এই সমকালের অস্থিরতার কাহিনি বিবরণ।

সত্তর দশকের সূচনায় কথাকারদের রচনায় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন দেখা দিল দ্রোহভাব, সাহিত্যিক আকল্পেও এই দ্রোহাত্মক মনোভাব থেকে প্রত্যাখ্যাত ও দূরীকৃত অপর জনসমাজ সম্পর্কে এবার দেখা দিল আগ্রহ আর আর্তি। সত্তর দশকে তরঙ্গায়িত এই সময়ের ধাক্কায় গল্পভাবনায় যে রীতিমতো পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – 'চৈতন্যের পাশফেরা।'

সুতরাং, সত্তরের দশক একই সঙ্গে নতুন প্রতিশ্রুতি আবার ব্যার্থতারও। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার যে আয়োজন চলছিল তা সর্বাংশে সার্থকতা না পেলেও একটা উজান স্রোত লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকীয় সমাজ কাঠামোয় যে পুনর্বিন্যাস শুরু

হয়েছিল নগরমুখী জীবনের ধাক্কায়, নগরমুখী সেই স্রোত খানিকটা যেন থমকে যায়, সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করে তুলতে চেয়ে। শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল কিছু মানুষ। সময়ের প্রবাহিত দিকটি বোঝাতে বলতে পারি ---

> "সত্তর দশক স্থবিরতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল বিরাট জাদু আয়নার মোহজাল। শপথ ছিল কাব্যিক নির্জনতা ছেড়ে যারা পথে প্রান্তরে কারখানায় কাজ করে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কলম হয়ে উঠবে শল্যকারের ছুরি, সমাজের শরীর থেকে বাদ দেবে জরাগ্রস্থ শিরা।"[১]

এই জঙ্গলযুক্ত সময়পর্বে দেখি, শক্তিশালী লেখক ভগীরথ মিশ্রের কলমে লেখা হয় পাঁচখন্ডে বিন্যস্ত 'মৃগয়া', 'আড়কাঠি', 'চারণভূমি'র মতো উপন্যাস। 'আড়কাঠিতে' দেখি অপরতার দর্পণে নিম্নবর্গীয়দের আসহায় আত্মসমর্পণের ইতিবৃত্ত। 'চারণভূমি'তে ভেড়িহার ভকতদের যাযাবর দিনযাত্রা এ উপন্যাসের আধেয়। অভিজিৎ সেনের 'আধার মহিষ' – হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করার ফলে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়, অমর মিত্র লেখেন 'ধনপতির চর', সাধন চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'জলতিমির', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেখেন চরভূমি নিয়ে আর এক উপখ্যান 'চরপূর্ণিমা', নলিনী বেরা লেখেন শবরদের জীবন যাপন নিয়ে এক নতুন আখ্যান – 'শবর চরিত', স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলি নিয়ে এক নতুন আখ্যান লেখেন 'চতুষ্পাঠী', রবিশঙ্কর বল লেখেন 'মিলনের শ্বাসরোধী কথা', 'দোজখনামা', রামকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন 'দুখে ক্যাওড়া'। সেখানে দেখি, এক প্রান্তিক চাষির দৃষ্টিকোন থেকে এক নতুন আখ্যান। তিনি লেখেন 'চন্ডীমঙ্গল'কে নিয়ে এক নতুন বিশ্লেষণ 'ধনপতির চর' এইভাবেই লেখকরা গল্পহীন জীবন নিয়ে নতুন নতুন উপন্যাস লিখে চলেছেন।

বঙ্গদেশে চিহ্নিত ভৌগলিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সীমার অন্তঃস্থ মানুষজন মাত্রেই বাঙালি এমন নয়, এমনকী ভাব আদান-প্রদানের ভাষা বাংলা হলেও, ভাষাগত সংস্থানের মধ্যে আছে জাতি-পরিচয় ও জাতিভেদের সমান্তরাল পার্থক্য, অসমতা। উক্ত উপন্যাসটি এই বিতর্ক ও আত্মসনাক্তকরণের সমাজতান্ত্রিক যুক্তির উপস্থাপনাও বলা যেতে পারে। বাঙালি জাতির সাথে সাথে বাঙালি ব্যাতিরেকে অপরাপর জাতি গোষ্ঠী যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ডুপকা, লেপচা, টোটো, মালপাহাড়ি, মদেশিয়া, লোহার, গারো, রাজবংশী, নেপালি, মেচ, রাভা, ধীমাল – তাদের বংশপরিচয়, সংস্কৃতি, নাচ, পোশাক, ধর্ম, রীতি-নীতি, তাদের সমাজ ও প্রত্যন্ত পার্বত্য সমাজ আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন লেখক। সমকালীন ইতিহাসকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নিতে তিনি খুব আগ্রহী। কেননা, সমসাময়িক ঘটনাসমূহ তাঁর কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হয়। তিনি উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন—

> "সমকালীন আন্দোলন নিয়ে উপন্যাস রচনা সবসময় খুব ঝুঁকির, কিন্তু আমি বরাবরই সমকালীন ইতিহাস নিয়ে লিখতে পছন্দ করি। এর আগে ঝাড়খন্ড আন্দোলন ও নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখেছি একাধিক উপন্যাস, লিখেছিলাম তেভাগা আন্দোলন নিয়েও এক বড়ো মাপের উপন্যাস। তাই কামতাপুরী আন্দোলন খুব কাছ থেকে জানার পর তা নিয়েও উপন্যাস লেখার উৎসাহ দমন করতে পারিনি।"[২]

কামতাপুরী আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হওয়া রক্তক্ষয়ী রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা সমূহকে অসাধারণভাবে লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আমাদের দেশ বহু জাতির বাস। বিশেষত দেশের নানা কোণ থেকে এসেছে নানা জাতির মানুষ। তারা কেউ বা পাহাড়ি, কেউ বা সমতলের, কেউ বা অরণ্যবাসী। তাদের প্রত্যেকের গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা আলাদা। এই প্রসঙ্গে লেখক অশোক কুমার দাস বলেন—

> "উত্তরবঙ্গ নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র বাঙালি সমাজের জ্বালা ও যন্ত্রণা। দেশ বিভাজনের বহু আগেই উত্তরাংশকে চিহ্নিত করতে এই নামকরণ হয়ে থাকবে। কোন প্রকার সাংস্কৃতিক বিভাজন থেকে এই নামকরণ হয় নি। বরঞ্চ বলা যায় যে আর্যসংস্কৃতির ঔদাসীন্যের কারণেই এখানকার বাঙালী জনগোষ্ঠীগুলো মূল স্রোত থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করছে।"[৩]

ইতিহাসের পাতা ঘাটলেই আমরা জানতে পারি যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যে সমস্ত মানুষেরা উত্তরবঙ্গে বাস করে তাদের মধ্যে রাজবংশীরাই প্রধান। তাছাড়া আছে মেচ, রাভা, ডুপকা, জালিয়া, কৈবর্ত, ধিমল, তেলি, যুগি – নানা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসার পর উৎখাত শুরু হয় এ দেশের ভূমিপুত্রদের, ক্রমে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা মানুষেরা কায়েম করে তাদের রাজত্ব। ফলে, এক সময় যারা ছিল বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক তাদের উত্তরাধিকারেরা ভূমিহীন, নিঃস্ব। ফলে—

> "তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মর্যাদা সবই এখন ধূলোয় লুটোচ্ছে।"[৪]

ইতিহাসের পথ বেয়ে আদিজাতি রাজবংশীদের বসতি স্থাপন বিশেষত তাদের প্রাধান্যই উত্তরবঙ্গকে চিহ্নিত করেছে আলাদাভাবে। কিন্তু, রাজবংশীরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে শুরু করেছে কামতাপুরী আন্দোলন, যারফলে উত্তরবঙ্গের সমস্যায় এখন এক নতুন মোড়ক।

লেখক তথ্যযোগে আমাদেরকে জানিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের ইতিহাস। প্রাচীনকালে কামরূপ নামে খ্যাত রাজ্য তারই অন্তর্গত ছিল উত্তরবঙ্গের একটি বড়ো অংশ। আমরা জানতে পারি, ক্ষমতার লড়াইয়ে সেন রাজবংশের পতন ও কোচবংশের উত্থান। আমরা আরও জানতে পারি, জলপাইগুড়ি গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং সেখানে আধিপত্য বিস্তারের কাহিনি। উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক উপন্যাসের ভূমিকায় আমাদের জানান—

> "উত্তরবঙ্গের নানা ইতিহাস পড়ে এই দাবির যৌক্তিকতা বোঝার চেষ্টা করেছি, কথা বলেছি বিপরীত রাজনৈতিক তত্ত্বলম্বী বহু মানুষের সঙ্গে, যাচাই করছি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানান ধরণের সংবাদ, এই আন্দোলন নিয়ে প্রকাশিত বিশিষ্ট তাত্ত্বিকদের প্রবন্ধাবলী, সেইসঙ্গে ঘুরেছি উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে, মালদহ থেকে কোচবিহার-এক বিশাল এলাকায় গিয়েছি নানা কাজে ও অকাজে।"[৫]

উপন্যাসে দেখতে পাই, একই সঙ্গে তিনটি জনগোষ্ঠী নিজেদের দাবি নিয়ে সোচ্চার। একদিকে দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়খন্ডীরা চায় কয়েকটি জেলা নিয়ে ভাগ হয়ে যেতে। অন্যদিকে উত্তরের পার্বত্য এলাকায় নেপালিভাষী জনগোষ্ঠীরা আন্দোলন করছে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে, আবার রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ চাইছে কামতাপুর রাজ্য গঠন করতে। প্রকাশ রায়ের মতো ক্ষমতালোভী নেতারা প্রাগজ্যোতিষপুর, কামতাপুর, কোচবিহার রাজ্যের গৌরব জনক ইতিহাস অবলম্বন করে কামতাপুরী আন্দোলনের কারণ হিসেবে অভিযোগ আনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের উপর। সেইসঙ্গে ভাষাগত আবেগ জুড়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজেদের ফায়দা লুটে নিতে চাইছে তারা। কেননা—

> "কামতাপুর রাজ্য হলে তিনি বসতে পারবেন সেই রাজ্যের মসনদে, হাতে পাবেন অগাধ ক্ষমতা।"[৬]

রাজ্যটি ছোটো ছোটো টুকরোতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এদিক দিয়ে কারোর কোনো মাথাব্যথা ধরা পড়ে না। ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার কথা বলতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র জানান—

> "বাংলা সাহিত্যেরই অনেকগুলো পৃথক পৃথক রূপ। ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা নিরিখে বোধ যদিও করি বাংলা ভাষা পৃথিবীতে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ। সেই ভাষার একটি অখন্ড সাহিত্যকর্ম সারা পৃথিবীর সাহিত্য দুনিয়ায় একটি মর্যাদার জায়গা পেতে পারত।"[৭]

স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জনজাতিদের একটি কাঙ্ক্ষিত আকার দেওয়ার গরজ ছিল রাষ্ট্রেরই। রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হয়েছে নতুন জনজাতির নীতি। নেহরুই বলেছেন—

> "The first problem we have to face there (in the tribal areas) is to inspire them (the tribal people) with confidence and make them feel at one with India and to realize are part of India and have an honoured place in it."[৮]

যে সমস্ত মানুষেরা কামতাপুরী আন্দোলনের মোহরা তাদের নব্বই শতাংশ মানুষই বেকার, কেউ কেউ রিক্সা বা অটো চালায়, কেউ বা অন্যের বাড়িতে পরিচালকের কাজ করে, কেউবা রাজমিস্ত্রি বা জোগালি অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ। তাদের দরিদ্র, অসহায়তাকে অস্ত্র বানিয়ে তাদের আন্দোলনে সামিল করে। সদু ওঁরাও নামের চা বাগানের এক কর্মীর কামতাপুরী আন্দোলনের দিকে ঝোঁকের কারণ হিসেবে জানতে পারি, তার পরিবার থাকত ক্যাম্পবেল চা বাগানের ঝুপড়িতে। বাগানের মালিক হঠাৎ করে চা বাগান বন্ধ করে দেওয়ায় তার বেছে নেয়। তার চিন্তা ভাবনায় উস্‌কে দেওয়া হয়—

> "বাবাকে যারা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে তাদের বিরুদ্ধেই তার লড়াই।"[৯]

আমরা দেখি যে এককালে তেভাগা আন্দোলনে যে রাজবংশীরা যোগদান করেছিল তাদের অধিকারের লড়াইয়ে। তাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের অধিকারের মিথ্যে আশ্বাসনে এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে ঠেলে দেয় সুবিধাভোগীরা। উপন্যাসে রাজবংশী এক বেকার যুবক রবি বর্মণের মুখে শুনতে পাই—

> "আলাদা রাজ্যের কথা বোঝে না। লিডাররা বলেছে আলাদা রাজ্য হলে তাদের সবারই চাকরি হবে, হবেই হবে।"[১০]

সুতরাং অধিকারের লড়াই বলে যুবক-যুবতীদের পথ বিভ্রান্ত করে তাদেরে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিষিদ্ধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র।

কিন্তু অনেকেই স্বার্থলোভীদের রাজনীতির জালে পা দিতে চায় না। দিনমজুর তারাপ্রসন্ন বর্মণের কথায় তা স্পষ্ট—

> "কামতাপুরী এসে ছেদ ঘটাতে চাইছে, তাঁদের সুস্থ জীবনযাত্রায়। ..... আমাদের দেশটাকে ভাগাভাগি করে কীই বা লাভ! বরং আমাদের ছেলে মেয়েদের চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করা হোক।"[১১]

আসলে বিচ্ছিন্নবাদীদের পক্ষে সাধারণ মানুষদের কোনো সমর্থন নেই। যারা বিচ্ছিন্নবাদী, তারা ইতিহাস, ভাষা আর নৃতত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা করে সহজ-সরল রাজবংশীদের বিপথে চালনা করে।

রাজ্য লাভের স্বপ্নকে সফল করতে তারা সাধারণ মানুষদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে অর্থ লুঠ করে নিজেদের মাসোহারা জোগাড় করে। কামতাপুরী আন্দোলনের নামে দলের কর্মীদের এরূপ অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অসহায়, ভয়ার্ত। উপন্যাসে, লুটতরাজিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে, মুক্তিপণের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া এক চা বাগানের ম্যানেজারকে সাংবাদিক অপ্রতিম বলে ---

> "এভাবে একের পর এক চা বাগানে চিঠি দিয়ে কে এল ও-রা অত্যাচার চালাবে, মাসোহারা দাবি করবে, সেই সরল সত্যটাও তো মেনে নেওয়া যায় না।"[১২]

আলাদা রাজ্যের দাবিতে শহরে শুরু হওয়া অরাজকতা সম্পর্কে লেখক উপন্যাসে মন্তব্য করেন—

> "বর্গিদের মতোই তারা এখন উত্তরবঙ্গের আতঙ্ক।"[১৩]

রাজনীতির খেলায় মত্ত আন্দোলনের নেতারা আন্দোলনকে ধ্বংসাত্মক রূপ দিয়ে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ভয়ঙ্কর চিন্তাধারার পরিণতি হাসিল করতে চায়। তাই তারা আলফা নেতাদের স্মরণাপন্ন হয়। প্রশাসনকে তাদের হাতে মুষ্ঠিবদ্ধ করতে, নেতা রামরতন সিংহের মুখে শুনতে পাই—

> "জাল কীরকম গুটিয়ে আনছি দেখতে পারছিস নে? আর ক-দিন পরেই আমরা শুরু করব নতুন যুদ্ধ।"[১৪]

আমরা দেখি যে, স্বাধীনতার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যতগুলি আন্দোলন হিংসাত্মকরূপ ধারণ করছে তার সবগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে জাতিগত পরিচয় রক্ষা করার তীব্র আকাঙ্খা। ইংরেজিতে যাকে বলতে পারি 'এথনো পলিটিক্যাল'। আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে যে দাঙ্গা শুরু করেছে তাতে তিক্ত হয়ে উঠে নাগাল্যান্ডের নাগা-কুকি সম্পর্ক, মিজোরামের মিজো-ব্রু সম্পর্ক, মেঘালয়ে গারো-খাসি সম্পর্ক। বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ যেমন সমতলে ছড়িয়ে তেমনি পাহাড়ি এলাকাতেও এর সন্ত্রাস দেখা দেয়। আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে, বিষাক্ত রাজনীতির খেলায় বলি হয় ধনপতি, কেশরি, চিরদ্বীপের মতো নিরীহ মানুষেরা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উত্তরবঙ্গকে যেভাবে ছোটো ছোটো টুকরোতে খন্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেরূপ রূপসার জীবনেও ভাঙচুর ঘটতে থাকে। কখনো তার পরিবারের সঙ্গে, কখনো তার নিজের সঙ্গে চলে মনোগত যুদ্ধ। সে বারবার নিজেকে পাল্টেছে, ভেঙ্গেছে, আবার নতুন করে নিজেকে গড়ে তোলে। রূপসার জীবনে স্বামী থাকা সত্ত্বেও, সে ছিল সঙ্গিহীন, তার জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল এক বিরাট শূণ্যতা। আত্মাভিমানী রূপসা স্বামীর সংসারে নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে, তার প্রতি উদাসীন ধৃতিমানকে নিজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে সহকর্মী অপ্রতীমের সাথে দুঃসাহসিক পথে পা বাড়ায়। তবু তার ভেতর এক অসহ্য যন্ত্রণা জেগে থাকে।

উপন্যাসের শেষে দেখি, জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত রূপসা তার ফাঁপা, ছন্নছাড়া জীবনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করে। উত্তরবঙ্গের উত্তাল পরিস্থিতিও রূপসার জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে যেন একটি যোগসূত্রে বেঁধেছেন লেখক। রূপসার মুখে শুনতে পাই—

> "উত্তরবঙ্গে প্রথম যেদিন এসেছিলাম আপনার সঙ্গে, আমার সংসার ছিল ভরভরন্ত। তারপর উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের সঙ্গে কীভাবে যেন জড়িয়ে গিয়েছিল আমার সংসারের ভাঙনও। এ ভাঙন কোনও দিন জোড়া লাগবে আমি ভাবতে পারিনি। এখন আমার স্থির প্রত্যয় হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ভাঙনো ঠেকানো যাবে। যতদিন তা না ঠেকানো যাচ্ছে, আমার ঘরে ফেরা হবে না।"[১৫]

আলোচনার শেষে বলা যায়, ক্ষমতাহীনরা নিম্নবর্গে পরিণত হচ্ছে। উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে আবার ক্ষমতা ব্যবস্থার জটিল কৌশলে ক্ষমতাশালীরা আবার নতুন করে দ্বিখন্ডিত ও ঔপনিবেশিত করতে চায়। গোষ্ঠীবদ্ধ জনজাতিরা নিজেদের আত্মপরিচয়, অখন্ডতা, স্বাধীনতা হারিয়ে কিছু ক্ষমতাসীন মানুষের, ঔপনিবেশিক বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে। আমরা বলতে

পারি যে, ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গরা একদিকে নিম্নবর্গের মানুষদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সব দিক থেকেই যেভাবে হাতে পায়ে পরাধীনতার শিকল পড়িয়ে রাখে, অন্যদিকে, নিম্নবর্গের চেতনা থাকা সত্ত্বেও তারা পরাধীন। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদের মধ্যে নিজেদের সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে কোনো হেলদোল দেখা যায় না। তারা যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে। সুতরাং, অতীতকাল থেকেই নিম্নবর্গকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় সেখানে নিম্নবর্গের স্থিরীকৃত স্থান আর বিনির্মিত হতে দেখা যায় না।

উল্লেখসূত্র:

১। দেবী মহাশ্বেতা, 'আমি/আমার লেখা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩, পৃষ্ঠা : ৯১।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'খন্ড বিখন্ড', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, ভূমিকা।
৩। ড. রায় দিলীপকুমার, 'উত্তরবঙ্গ দর্পন', সম্পাদক, প্রমোদ নাথ, এন.ই.পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ-২০০৯, পৃঃ ১৫।
৪। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ২৯।
৫। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, ভূমিকা।
৬। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ২৯।
৭। মজুমদার সমীরণ, 'অমৃতলোক' ১০৬, সম্পাদক, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃঃ ৩৪৬।
৮। 'India after Independence 1947-2000', Bipin Chandra, Mridula Mukharji, Aditya Mukharji, Penguin Books, 2000, p-784.
৯। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১১২।
১০। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১২৯।
১১। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১৫৯।
১২। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১৩০।
১৩। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১৩৪।
১৪। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ১৩২।
১৫। 'খন্ড বিখন্ড', অনুরূপ, পৃঃ ২৭১।

*****